HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০১ বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা
টপিক ০২: মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)
টপিক ০৩: মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা
টপিক ০৪: যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি
টপিক ০৫: যৌথ বাহিনীর অভিযান
টপিক ০৬: মুক্তিযুদ্ধের প্রচার
টপিক ০৭: মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা
টপিক ০৮: মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা
টপিক ০৯: পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের আকৃতি খুব বড় না হলেও তা অত্যন্ত কার্যকর ও দক্ষ ছিল। সেসময়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানতেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির বাঁচা-মরার লড়াই। এ লড়াইয়ে জিততে না পারলে জাতি হিসেবে বাঙালি চরম বিপর্যয়ের শিকার হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের সব কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হয়েছে এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্র জারির পরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম 'আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগ আদেশ-১৯৭১' জারি করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন-

"আমি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণায় আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মর্মে আদেশ প্রদান করছি যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে যেসব আইন ও বিধিবিধান কার্যকর ছিল সে সমস্তই প্রয়োজনীয় অবস্থানগত পরিবর্তনসহ পূর্বোক্ত ঘোষণা সাপেক্ষে বলবৎ থাকবে এবং সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেসামরিক, সামরিক, বিচারবিভাগীয়, কূটনীতিক যারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ করবেন তারা সকলেই স্ব স্ব পদে চাকুরিবিধির শর্তানুযায়ী যেভাবে কর্মরত ছিলেন তারা সেভাবেই কর্মরত থাকবেন এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সকল জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যত্র কর্মরত কূটনীতিক প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের আওতাধীন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।"

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এই 'আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগ আদেশ' জারির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আইনানুগ পদযাত্রা শুরু হয়। নির্দেশিত হয়ে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম (সাবেক জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্টগ্রাম) ১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংগঠন এবং কার্যাবলির ওপর একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। সে প্রতিবেদন অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংগঠিত হয়েছিল নিম্নরূপে':

১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩. অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪. মন্ত্রিসভা সচিবালয়
৫. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
৬. স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১০. সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১১. কৃষি বিভাগ
১২. প্রকৌশল বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

উল্লিখিত ১২টি মন্ত্রণালয় ছাড়া কয়েকটি সংস্থা ছিল যেগুলো সরাসরি মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করত। যেমন-

১. পরিকল্পনা কমিশন
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড
৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড
৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

১৯৭১ সালে ১৮ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিম্নলিখিতভাবে মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্ব বণ্টিত হয়:

তাজউদ্দীন আহমদ- প্রধানমন্ত্রী

ক. প্রতিরক্ষা

খ. তথ্য ও বেতার এবং টেলিযোগাযোগ

গ. অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ঘ. শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, সামাজিক উন্নয়ন

ঙ.সংস্থাপন এবং প্রশাসন

চ. অন্য সব বিষয় যা অন্য কোনো মন্ত্রীকে বণ্টন করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী, সেনাপ্রধান লে. কর্নেল আবদুর রব, বিমানবাহিনীর প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, এগারো জন সেক্টর কমান্ডার এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্সের প্রধানগণ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখা

খন্দকার মোশতাক আহমদ

ক. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

খ. আইন ও সংসদ বিষয়াবলি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব খন্দকার মোশতাক আহমেদের হাতে ন্যস্ত হলেও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার কার্যক্রমের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করতেন। কেননা, খন্দকার মোশতাক আহমেদ মার্কিনপন্থি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং বন্ধু ও সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চালানো। কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন; বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো; জাতিসংঘে প্রতিনিধি প্রেরণ; আফগানিস্তান, নেপাল, সিরিয়া ও লেবানন, শ্রীলঙ্কা, বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ; বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা জোরদার করা ইত্যাদি ছিল এ মন্ত্রণালয়ের কাজ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০২ মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই আসন্ন এবং এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা ও কর্মকর্তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকনির্দেশনার অপেক্ষায় থাকেন। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ২৫ মার্চের গণহত্যার পর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের মানুষ। ঘটনাপ্রবাহ ও বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৪টি পর্যায় অতিক্রম করে বিজয় অর্জন করে। ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়। এসময় দেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রথাগত সম্মুখ লড়াই ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সুপ্রশিক্ষিত পেশাদার সৈন্যদের আধুনিক মারণাস্ত্রের সাঁড়াশি আক্রমণে প্রতিরোধকারীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এসময় মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ১ মে থেকে জুন পর্যন্ত। এ সময় মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

তখন থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুটা পরিকল্পিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায়টি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময় মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালায়। চতুর্থ পর্যায়ের সময়কাল সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। এ সময় সর্বাত্মক যুদ্ধ চলে এবং বাংলাদেশের নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ভারতের মিত্র বাহিনীর সেনারা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করতে সরাসরি রণাঙ্গণে যোগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিবাহিনী (মুক্তিফৌজ, ফ্রিডম ফাইটার এবং বাংলাদেশ ফোর্স) গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা বাহিনীগুলোর মুজিবনগর সরকারের সাথে কোনো বিরোধ ছিল না। তারা এ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেই অঞ্চল বিশেষে বাহিনী গড়ে তুলে লড়াই করেছিল। মুক্তিবাহিনী ছিল দুই ধরনের। যথা ক. নিয়মিত বাহিনী ও খ. অনিয়মিত বাহিনী।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

নিয়মিত বাহিনী (Regular Force)

সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলো, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পরে বিডিআর বর্তমানে বিজিবি), পুলিশ ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটালিয়ন কর্মরত ছিল যার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। ইপিআর-এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,০০০। পুলিশ ও আনসার ছিল আরও কয়েক হাজার। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটালিয়নকে ১১টিতে উন্নীত করা হয়। এগুলো ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ১১নং ব্যাটালিয়ন। এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তোলা হয়। সেক্টর ট্রুপস-এর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন অংশ থেকে আসা সদস্যদের নিয়ে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস গড়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে ৩টি ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডগুলোর কমান্ডারদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে এদের নামকরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী ছিল নিয়মিত বাহিনী। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,৬০০।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

অনিয়মিত বাহিনী (Irregular Force)

ছাত্র, যুবক, কৃষক-শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় সব পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী 'গণবাহিনী' বা গেরিলা বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। এ বাহিনীর সরকারি নাম ছিল এফ.এফ (ফ্রিডম ফাইটার) অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের দুই সপ্তাহের ট্রেনিং শেষে একজন কমান্ডারের অধীনে নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হতো। তবে কিছুসংখ্যক গেরিলার জন্য একটি বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা ছিল। একে বলা হতো স্পেশাল কোর্স। ছয় সপ্তাহের এই কোর্সে গেরিলা নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এতে আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার (Urban Guerrilla Warfare) অর্থাৎ শহর অঞ্চলের আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতি শেখানো হতো। এসব বাহিনী ছাড়াও কিছু স্থানীয় বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিল। যেমন-

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

কাদেরিয়া বাহিনী (Kaderia Force)

টাঙ্গাইল জেলায় আবদুল কাদের সিদ্দিকী এই বাহিনী গড়ে তোলেন। তার নাম অনুসারে এই বাহিনীর নাম হয়েছিল 'কাদেরিয়া বাহিনী'। এ বাহিনীতে প্রায় ১৭হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও ৭০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছিল। কাদেরিয়া বাহিনী মূলত গেরিলাবাহিনী হলেও এরা প্রচলিত 'Hit and Run' (হামলা করেই পালিয়ে যাওয়া) পদ্ধতির পরিবর্তে 'Hit and Advance' নীতি অনুসরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য কাদের সিদ্দিকীকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনিই একমাত্র বেসামরিক বীর উত্তম।

আফসার বাহিনী (Afsar Force)

শুরুতে মাত্র একটি রাইফেল নিয়ে মেজর আফসার উদ্দিন তার 'আফসার বাহিনী' গড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫০০ জন। সামরিক ধাঁচে গড়ে তোলা এ বাহিনী ৫টি ব্যাটালিয়ন ও ২৫টি কোম্পানিতে বিভক্ত ছিল। ১৯৭১ সালের জুন মাসে ভালুকা থানার ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকিস্তানিদের সাথে বিরতিহীন ৪৮ ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এই বাহিনী অসামান্য বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

হেমায়েত বাহিনী (Hemayet Force)

গোপালগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আরো কিছু বাঙালি সৈনিক নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসেন। তারপর নিজ গ্রামে তিনি বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি কোটালিপাড়ার জহুরেরকান্দি হাইস্কুলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন এবং তিন মাসে প্রায় ৪,০০০ যুবককে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেন। তার বাহিনীতে মোট মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৫০৫৪ জন। এদের মধ্যে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল ৩৪০ জন। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত উদ্দিনের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর সরকার তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করে।

এছাড়া হালিম (মানিকগঞ্জ), আকবর (মাগুরা), লতিফ মীর্জা (পাবনা-সিরাজগঞ্জ), জিয়া (সুন্দরবন) প্রভৃতি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এসব গেরিলা বাহিনী ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ। এলাকাভিত্তিক এসব আঞ্চলিক বাহিনীর প্রশিক্ষিত মোট সদস্যসংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি। এদের সাথে সারাদেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিল প্রায় তিন থেকে চার লাখ সদস্য।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

মুজিব বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স' (Bengal Liberation Force অর্থাৎ B.L.F.) 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক একটি সংগঠন। ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোনো উগ্রপন্থি বা চরমপন্থি দলের হাতে চলে না যায় তা খেয়াল রাখাও মুজিব বাহিনীর কাজ ছিল।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

বিমান বাহিনী (Air Force)

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এয়ার কমোডোর এ. কে. খন্দকার। তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল পি. সি. লালের সঙ্গে দেখা করে বিমান বাহিনী গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ. কে. খন্দকারের সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন সাত্তার, ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন আকরাম ও ক্যাপ্টেন শরফুদ্দীন। পাকিস্তান এয়ারফোর্স থেকে পালিয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লে. শামসুল আলম, ফ্লাইট লে. বদরুল আলমসহ আরও ৬৭ জন বৈমানিক। তাছাড়া প্রায় ৩০০ জন জুনিয়র টেকনিশিয়ানও তাদের সাথে ছিলেন। ভারতীয় বিমানবাহিনী থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া ১টি টুইন অটার বিমান, ১ টিএলুভেট ৩ হেলিকপ্টার এবং ১টি ডিসি ৩ ডাকোটা বিমান নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় রাতের আধাঁরে প্রশিক্ষণ নিতেন সদ্যগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যরা। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিল।

মুক্তিবাহিনী গঠন (স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী)

নৌ বাহিনী (Navy Force)

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর ৮ জন বাঙালি সাব-মেরিনার পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতীয় দূতাবাসের সহযোগিতায় তারা ৯/১০ এপ্রিল ভারতে পৌছান। এরপর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং কর্নেল এমএজি ওসমানীর প্রচেষ্টায় ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরপর সীমান্ত এলাকার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো থেকে ৩৫৭ জন সুঠামদেহী যুবককে বাছাই করে ১৩ মে থেকে পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী নদীতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সে প্রশিক্ষণে নৌ কমান্ডোদের লিমপেট মাইনসহ বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়া হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌসেনা নিয়ে গড়ে তোলা হয় 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী'। ভারতের কাছ থেকে পাওয়া এমভি পলাশ ও এমভি পদ্মা নামে দুটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, বরিশাল, মংলা, সমুদ্রবন্দর, আশুগঞ্জ, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, ফুলছড়িঘাট, গোয়ালন্দ, নগরবাড়ি, দাউদকান্দি ও আরিচা নদীবন্দরে সরাসরি দুঃসাহসী আক্রমণ চালানো হয়। মুক্তিযুদ্ধে নৌসেনাদের বীরত্বপূর্ণ এ অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত। জুলাই মাসে সেক্টর কমান্ডার্স কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৫১৫ জনে। এদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল ১০ নং সেক্টর। এ সেক্টরের কোনো নির্দিষ্ট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৩ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

সেক্টর কমান্ড (Sector Command)

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীর নেতৃত্বে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগান এলাকার বাংলোতে বাঙালি সামরিক অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, কর্নেল রবসহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠিত করে একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার কথা আলোচনা করেন। বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রথমে সারা দেশকে ৪টি সেক্টরে বিভক্ত করে চারজন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। পরে ১১-১৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আলোচনা করে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক সেক্টরে বিভক্ত করেন। ১১ জন সামরিক কর্মকর্তাকে এসব সেক্টরের কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা অফিসারদের এ সেক্টরগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও কমান্ডারদের তালিকা:

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ ও কমান্ডারগণ

সেক্টরের নাম	নির্দিষ্ট এলাকা	সেক্টর কমান্ডার
১ নং সেক্টর	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা	মেজর জিয়াউর রহমান ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম
২ নং সেক্টর	নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব, কুমিল্লা, সিলেট জেলার সীমান্ত, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ	মেজর খালেদ মোশাররফ মেজর এটিএম হায়দার
৩ নং সেক্টর	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ ও কিশোরগঞ্জ	মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ক্যাপ্টেন এ. এন. এম নুরুজ্জামান
৪ নং সেক্টর	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত	মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত ক্যাপ্টেন এ. রব
৫ নং সেক্টর	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত	মেজর মীর শওকত আলী
৬ নং সেক্টর	রংপুর জেলা, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও জেলা	উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার
৭ নং সেক্টর	দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা	মেজর নাজমুল হক, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, সুবেদার মেজর এ. রব
৮ নং সেক্টর	কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ, খুলনার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা পর্যন্ত	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী মেজর আবুল মনজুর
৯ নং সেক্টর	দৌলতপুর-সাতক্ষীরা থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী	মেজর এম. এ. জলিল, মেজর এম. এ. মনজুর, মেজর জয়নাল আবেদীন
১০ নং সেক্টর	নৌকমান্ডো, উপকূলীয় অঞ্চল, জেলা অভ্যন্তরীণ নৌপথ	বাংলাদেশ ফোর্সের হেড কোয়ার্টার
১১ নং সেক্টর	কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা	মেজর আবু তাহের, স্কোয়াড্রন লিডার এম. হামিদুল্লাহ খান

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্নেল ওসমানী তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করেছিলেন। ফোর্সগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল ব্রিগেড অধিনায়কদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিয়ে এ ব্রিগেডগুলো গঠিত হয়েছিল। বিগ্রেডগুলোর তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

ফোর্সের নাম	অধিনায়ক	গঠন প্রক্রিয়া
জেড ফোর্স	মেজর জিয়াউর রহমান	১ম, ৩য় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত।
কে ফোর্স	মেজর খালেদ মোশাররফ	৪র্থ, ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত।
এস ফোর্স	মেজর কে এম সফিউল্লাহ	২য় এবং ১১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

জোনাল কাউন্সিল (Zonal Council)

মুজিবনগর সরকার একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সারা বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছিল 'জোনাল কাউন্সিল'। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী ১৯৭০-৭১ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে এই জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরা নির্বাচিত হতেন। প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে আঞ্চলিক প্রশাসকও (জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) নিয়োগ করা হয়। এরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও এর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। জোনাল চেয়ারম্যানরা তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে রাজনৈতিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করতেন। শরণার্থী সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সামরিক ও বেসামরিক বিষয়াবলির সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণভার এ জোনাল কাউন্সিলগুলোর ওপর ন্যস্ত ছিল। এছাড়া এ কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল-

১. মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো পরিচালনা করা।

২. মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

৩. তথ্য দফতর থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও পোস্টার শরণার্থী শিবিরসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪. হানাদার-দখলীকৃত কোনো অঞ্চল থেকে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী পালিয়ে এসে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিলে তার নাম তালিকাভুক্ত করা এবং তাকে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

মুজিবনগর সরকারের ১১টি জোনাল কাউন্সিল এবং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ[৪]

প্রশাসনিক অঞ্চল	আঞ্চলিক চেয়ারম্যান	আঞ্চলিক প্রশাসক	আঞ্চলিক সদর দপ্তর
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	এস এ সামাদ	সাবরুম
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-২	জহুর আহমেদ চৌধুরী	কাজী রকিব উদ্দিন	আগরতলা
পূর্ব অঞ্চল	কর্নেল এম এ রব	ডা. কে এ হাসান	ধর্মনগর
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১	দেওয়ান ফরিদ গাজী	এস এইচ চৌধুরী	ডাউকি
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-২	সামছুর রহমান খান	লুৎফর রহমান	তুরা
উত্তর অঞ্চল	মতিউর রহমান	উয়েজ উদ্দিন আহমেদ	কোচবিহার
পশ্চিম অঞ্চল-১	মো. আবদুর রহিম	এম এ কাশেম খান	বালুরঘাট
পশ্চিম অঞ্চল-২	আশরাফুল ইসলাম মিয়া	জহুরুল ইসলাম ভূইয়া	মালদহ
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-১	আবদুর রউফ চৌধুরী	শামসুল হক	কৃষ্ণনগর
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২	ফণীভূষণ মজুমদার	বি বি বিশ্বাস	বনগাঁও
দক্ষিণ অঞ্চল	আবদুর রব সেরনিয়াবাত	এ মমিন	বারাসাত

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থাপনা

উপরের অঞ্চলগুলোর প্রতিটিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে আঞ্চলিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল:

১. আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
২. আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৩. আঞ্চলিক ত্রাণ কর্মকর্তা
৪. আঞ্চলিক প্রকৌশল কর্মকর্তা
৫. আঞ্চলিক পুলিশ কর্মকর্তা
৬. আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা
৭. আঞ্চলিক হিসাব কর্মকর্তা

উক্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৪ যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি (All Party Advisory Committee)

মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মুজিবনগর সরকার উপলব্ধি করে, যুদ্ধকে দ্রুত চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা অপরিহার্য। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন দলের নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে সব রাজনৈতিক দলকে এ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। ভাষণে তিনি বলেছিলেন,' আমরা বিশেষ করে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাংলাদেশের এই সংঘবদ্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছি।" ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী সব দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী ছিলেন এ কমিটির সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন আহ্বায়ক। এ কমিটির সদস্যরা ছিলেন-

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

১. মওলানা ভাসানী- সভাপতি, পিকিংপন্থি ন্যাপের প্রতিনিধি
২. তাজউদ্দীন আহমদ আহ্বায়ক, মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি
৩. অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ- মস্কোপন্থি ন্যাপের প্রতিনিধি
৪. মনি সিং- কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি
৫. মনোরঞ্জন ধর- কংগ্রেস দলের নেতা
৬. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী- আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি
৭. এ এইচ এম কামারুজ্জামান- আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি
৮. খন্দকার মোশতাক আহমদ- আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি

এ কমিটির সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য হবে না। এই কমিটির কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে মুজিবনগর সরকারকে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধ (From Guerrilla War to Front Battle)

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল পরিকল্পনাবিহীন। কেননা বাঙালি জাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের ওপর একরকম আকস্মিকভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একদিকে অস্ত্রসহ যুদ্ধ উপকরণের অপ্রতুলতা এবং অন্যদিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব- এই দু'টি কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটি পরিকল্পিত লড়াইয়ে রূপ দিতে জুন মাস পেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে মুজিবনগর সরকারের পরিচালনায় এবং ভারতীয় সরকারের সহযোগিতায় হাজারো বাঙালি তরুণ-যুবক-ছাত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়। এদিকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনীও গড়ে ওঠে। আগস্টের পর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অপারেশন চালিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দালাল-দোসরদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত করে তোলেন। পাশাপাশি রণাঙ্গণে মুখোমুখি লড়াইও চলে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জেসিও এবং অন্যান্য শ্রেণির ৩,৫৫৯ জন সৈন্য নিহত হয়।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য স্থাপনাগুলোর মধ্যে অস্ত্র ও রসদ আদান-প্রদানের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের সমস্যার মধ্যে ফেলা। এরপর বিচ্ছিন্ন ঘাঁটিগুলোকে আচমকা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। অক্টোবর নাগাদ মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের ঘাঁটিগুলোতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি দিনের বেলাতেও তারা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ঘাঁটির বাইরে বেরোত না।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

স্থলযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপর্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি বাঙালি নৌ কমান্ডোরা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। তারা গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে আগস্ট মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে 'এম ভি হরমুজ' এবং 'এম ভি আব্বাস' জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। পরের মাসে তারা আরও ২০টি পাকিস্তানি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। নৌ-গেরিলাদের আক্রমণের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলো প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। বাঙালি নৌ-সেনারা অনেক পাকিস্তানি জাহাজ নিমজ্জিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি বেশ কিছুসংখ্যক নৌযান দখলও করে। দুঃসাহসী 'অপারেশন জ্যাকপটের' আওতায় নৌ কমান্ডোরা বড় ধরনের ৪৫টি সফল অপারেশন চালিয়ে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এ হামলা পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবলে বিরাট আঘাত হানে ও ভেঙে পড়ে। গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের পাশাপাশি নৌকমান্ডোদের এসব সফল আক্রমণের খবর বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচারিত হলে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহ ও সমর্থন ক্রমেই জোরালো হতে থাকে। যুদ্ধের কারণে সেপ্টেম্বর থেকে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে কোন বিদেশি জাহাজ আসতে রাজি হয়নি। এর ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সংকট দেখা দেয়।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

মুক্তিবাহিনী

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সফলতা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের সীমাহীন নির্যাতন-অত্যাচার থেকে সৃষ্ট ঘৃণা, অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য দেশের আপামর জনসাধারণকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

অক্টোবর মাসের ২২ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লি গিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করেন। তাদের বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী গঠন করে একযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত একটি সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৫ যৌথ বাহিনীর অভিযান

যৌথ বাহিনীর অভিযান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড' গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এ যৌথবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুই দেশের যৌথবাহিনী বাংলাদেশকে ৪টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করে। খুলনা বিভাগ ও ফরিদপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয় দক্ষিণ সেক্টর। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের ৮ ও ৯ নং সেক্টরের কর্মকর্তারা এ সেক্টরের দায়িত্ব নেন। রাজশাহী বিভাগের সবগুলো জেলা উত্তর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিত্রবাহিনীর সাথে ৬নং ও ৭নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের এ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফরিদপুর বাদে পুরো ঢাকা বিভাগ ছিল মধ্য সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা এবং জেড ফোর্স এখানে মিত্রবাহিনীর সাথে একজোট হয়ে লড়াই করে। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলো ছিল যৌথবাহিনীর পূর্ব সেক্টরের মধ্যে। ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ নং সেক্টর এবং 'এস' ও 'কে' ফোর্স এ সেক্টরে লড়াই করে।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

যৌথবাহিনীর এ প্রস্তুতির খবর পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনী আরও হতাশ হয়ে পড়ে। যৌথবাহিনী গঠনের দুদিন পর ২৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'এতদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তানে - (বাংলাদেশে) যে যুদ্ধ চলে আসছিল, তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।' সেদিনই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি অবহিত করে জরুরি বার্তা পাঠান। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীও একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৫ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান যে কোনো সময় বড় ধরনের যুদ্ধের ইঙ্গিত দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি ক্রান্তিলগ্নে পৌছায় এবং বিশেষ গতি পায়।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ। পেশোয়ার বিমানবন্দর থেকে ১২টি যুদ্ধবিমান উড়ে যায় কাশ্মীরের শ্রীনগর ও অনন্তপুরের উদ্দেশ্যে এবং সারগোদা বিমানঘাঁটি থেকে আটটি বিমান উড়ে যায় অমৃতসর ও পাঠানকোটের দিকে। দুটি যুদ্ধবিমান পাঠানো হয় ভারতীয় ভূখণ্ডের গভীরে আগ্রায় আঘাত করার উদ্দেশ্যে। মোট ৩২টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয় এই পাকিস্তানি আক্রমণে। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি অবিলম্বে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পর মধ্যরাতের কিছু পরে ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের জের ধরে শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিমান হামলার জবাবে পাল্টা আক্রমণে ভারত পাকিস্তানের বিমানঘাঁটিগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করে। তাদের আর আকাশপথে আক্রমণের সামর্থ্য থাকে না বললেই চলে। অন্যদিকে শুরু হয় স্থল অভিযান।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

৪ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত পথে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর স্থল অভিযান শুরু হয়-

১. পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশন আকারের ৪র্থ কোর সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা-নোয়াখালী অভিমুখে।

২. উত্তরাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অভিমুখে।

৩. পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ২য় কোর যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অভিমুখে।

৪. মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে আর একটি বাহিনী জামালপুর-ময়মনসিংহ অভিমুখে।

যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি

১১-১২ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌছে। এ অবস্থায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ঢাকার শাহবাগের পাঁচতারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে সেখানে কূটনীতিক ও বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেয়। ঢাকা মুক্ত করার জন্য ব্যাপক স্থলযুদ্ধ এড়াতে মিত্রবাহিনী ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পাকিস্তানি সামরিক অবস্থানগুলোতে ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সরকারের গভর্নর আবদুল মালিক পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। যৌথবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত আহ্বান জানিয়ে বিমান থেকে লিফলেট ফেলে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে। যে কোনো সময় ঢাকা দখল করা সম্ভব হলেও যৌথবাহিনী সম্মুখযুদ্ধে উভয়পক্ষে ব্যাপক প্রাণহানি এড়াতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর স্থানীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের জন্য সময় বেঁধে দেয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৬ মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধের খবরাখবর সারাদেশে এবং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এসব পত্র-পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। সবশ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে তরুণ-যুবকরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর পত্রিকা ও বেতারে ফলাও করে প্রচার করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (The Radio Station of Independent Bengal)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল এক কথায় অনন্য সাধারণ। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের আনাচে-কানাচের সব শ্রেণির মানুষের যোগাযোগ ছিল প্রায় সার্বক্ষণিক। অনেক সময় মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়ে রেডিও লেপ-কাঁথা দিয়ে ঢেকে কম আওয়াজে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বা অনুষ্ঠান শুনতো। এই অস্থায়ী সম্প্রচার কেন্দ্রটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার রেডিও পাকিস্তানের শিল্পী ও স্ক্রিপ্ট রাইটার বেলাল মোহাম্মদ তার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে চট্টগ্রামের স্বল্পপাল্লার কালুরঘাট ট্রান্সমিটার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে পরিণত করেন। বেলাল মোহাম্মদের সঙ্গে আরও ছিলেন আবদুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাশেম সন্দীপ, কাজী হাবিব উদ্দিন, আহমেদ মনি, আমিনুর রহমান, রাশিদুল হোসাইন, এ এম শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুস শাকুর, মুস্তফা আনোয়ার প্রমুখ। ১৯৭১ সালের ২৬ থেকে ৩০ মার্চ এই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর ও অনুষ্ঠান দেশের মানুষকে সাহস যোগায় ও স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

ঢাকায় পাকিস্তানিদের ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার পর ২৭ মার্চ এ বেতার কেন্দ্র থেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন তখন চট্টগ্রামে উপস্থিত মেজর জিয়াউর রহমান। দেশবাসী জানতে পারে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা। ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণে কালুরঘাটের বেতার ট্রান্সমিটারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তখন কয়েকজন দুঃসাহসী বেতারকর্মী এক কিলোওয়াটের একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার একটি ট্রাকে বসিয়ে বাঙালি সৈনিকদের প্রহরায় দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তে নিয়ে যান। তারা সেখান থেকে অনিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখেন। পরে কিছুদিন এর অনুষ্ঠান ভারতের ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে সম্প্রচার করা হয়। ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত আগরতলাতেই এর কার্যক্রম চলে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়। আবদুল মান্নান এমএনএ-কে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মে ৫০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নতুন করে যাত্রা শুরু করে। প্রতিদিন দুটি অধিবেশন সম্প্রচারিত হতো। প্রথম অধিবেশন শুরু হতো সকাল ৭টায় এবং দ্বিতীয় অধিবেশন সন্ধ্যা ৭টায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল:

অগ্নিশিখা: মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান।

রক্তসাক্ষর: সাহিত্য আসর।

বজ্রকণ্ঠ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেকর্ড করা বক্তৃতা, বিশেষ করে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রচার।

দর্পণ: যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান।

জাগরণী: জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী সংগীতানুষ্ঠান।

ঐকতান: সংগীতানুষ্ঠান।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

চরমপত্র : এটি ছিল একটি রম্য অনুষ্ঠান। মুক্তিযোদ্ধাসহ বাঙালি জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যুদ্ধে তাদের দুদর্শার চিত্র তুলে ধরা হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি কৌতুক, লোককথা, গান থাকতো এই অনুষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দেশি-বিদেশি পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হতো। চরমপত্র রচনা ও পাঠ করতেন সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল।

সংবাদ: ইংরেজি ও বাংলা খবর।

বিশ্ব জনমত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য এতে তুলে ধরা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

পত্র-পত্রিকা (Magazine and News Papers)

পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে যে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছিল, তার খবর যাতে বহির্বিশ্ব জানতে না পারে সেজন্য সব বিদেশি সাংবাদিককে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। এছাড়া স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর ওপর তারা সেন্সরশিপ আরোপ করেছিল। গুটিকয়েক বিদেশি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে ঢাকায় রয়ে যান। তাদের একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং (যিনি অনেক দিন পরে 'একুশে টিভি'র সঙ্গে যুক্ত হন)। সাইমন ড্রিংয়ের দুঃসাহসিক সাংবাদিকতার সুবাদেই বিশ্ববাসী জানতে পারে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম গণহত্যার কথা।

লন্ডনের 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ', এবং অস্ট্রেলিয়ার 'দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' এ দুটি পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে বিশ্ববাসী পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের খবর জানতে পারে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল এবং দেশের বাইরে যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ লড়াইয়ের খবর, মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এর নেতাদের বক্তব্য-বিবৃতি, প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন প্রচার ও সহায়তা কার্যক্রম এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালি কূটনীতিকদের তৎপরতার খবরাখবর প্রকাশিত হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের কর্মকাণ্ডের সাফাইও কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' ছিল এর অন্যতম। এতে মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয়দের ষড়যন্ত্র বলে নিন্দা করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার

সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। ১১ মে ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আবদুল মান্নান এমএনএ ছিলেন এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং জিল্লুর রহমান ছিলেন প্রধান সম্পাদক। এসময়ে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক। 'নতুন বাংলা' ছিল ন্যাপের মুখপত্র। ১৯৭১ সালের ২১ আগস্ট থেকে এটি প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম শাখা থেকে প্রকাশিত হতো 'পাক্ষিক স্বাধীন বাংলা'। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র ছিল 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা', নওগাঁর 'জয় বাংলা' ও 'বঙ্গবাণী', বরিশালের অর্ধ সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ', রাজশাহীর 'সাপ্তাহিক স্বদেশ' ও 'সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা', পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ' এবং 'সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ' ও 'সাপ্তাহিক বাংলার বাণী' সহ বেশ কিছু পত্রিকা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ও বিদেশ থেকে কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো: Bangladesh, The Nation, Bangladesh News Letters (Britain), Bangladesh Today (Britain), Bangladesh News Bulletin (USA), Bangladesh (Canada) প্রভৃতি। এসব পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশে-বিদেশে জনমত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৭ মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল এক বিরাট অধ্যায়। এটি ছিল আসলে এক বিশাল কূটনৈতিক যুদ্ধ। বিশ্বের অন্যতম দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের বিপরীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এই দূরূহ ও বিশাল কর্মযজ্ঞ মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছিল।

শুরু থেকেই এ সরকার বিদেশি মিশনগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়ে, প্রবাসী বাঙালিদের মাধ্যমে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি প্রোপাগান্ডার উপযুক্ত জবাব দিতে চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুইটি-

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করা এবং

খ. মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার (তখন কুষ্টিয়া জেলা) বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করার পরদিন ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান হাইকমিশনের সব বাঙালি কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কূটনীতিক এম হোসেন আলীর নেতৃত্বে হাইকমিশন অফিস দখল করে সেখানেই মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর বাংলাদেশ সরকার তার পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করে। এ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল-

ক. সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।

খ. সব রকম শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান।

গ. জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি।

অতি দ্রুত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করা হয়। কলকাতা, নয়া দিল্লি, লন্ডন, স্টকহোম, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, হংকং, ম্যানিলা, কাঠমান্ডু, বার্ন, টোকিও প্রভৃতি শহরে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়

Mobilising Support For The Liberation War

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমতের সমর্থন আদায় করা এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য জেনেভায় এসেছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে থেকেই নানামুখী তৎপরতা চালান। দীর্ঘ নয় মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি জেনেভা, লন্ডন, নিউইয়র্ক চষে বেড়ান।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

১৮ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিদেশে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবীদের নিহত হওয়ার বিবরণ দেন। তার তৎপরতায় ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সর্বসম্মতভাবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হয় যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাজ্যের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা উচিত। এরপর আবু সাঈদ চৌধুরী স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্বজনমতের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ১ আগস্ট এক জনসভার আয়োজন করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ হাজারেরও বেশি বাঙালি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ জনসভায় বিচারপতি আবু সাঈদ মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশের কথা ঘোষণা করেন-

ক. শীঘ্রই লন্ডনে একটি হাইকমিশন স্থাপন করা হবে।

খ. বাঙালিরা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের বিমানে ভ্রমণ করবে না।

গ. পাকিস্তান কিংবা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে তারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর এই ঘোষণার পরপরই যুক্তরাজ্যের পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর একে একে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু করলে ১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এ বিচারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মে মাসের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে মুজিবনগর সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়। তিনিই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। সেপ্টেম্বরে তাকে দ্বিতীয় দফা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। রেহমান সোবহান সেবার বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য তদবির করেন। এ পর্যায়ে তিনি নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের পক্ষে তদবির করেন। তিনি বাঙালি ও মার্কিন শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলেও যোগ দেন। নিউইয়র্কে এইড কনসোর্টিয়ামের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানকে কোনো বৈদেশিক সাহায্য না দেওয়ার জন্য জোরালো আবেদন জানান রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, ওই সাহায্যের অর্থ বাংলাদেশে বাঙালি নিধনকাজে ব্যবহৃত হবে। তার যুক্তিতে আশ্বস্ত হয়ে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিনিধি দল জুন মাসে যুদ্ধপীড়িত বাংলাদেশ সফর করে। ওই প্রতিনিধি দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে ২ অক্টোবর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত দাতাগোষ্ঠীর সভায় পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া স্থগিত করা হয়। বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সমর্থন দিলেও প্রতিশ্রুত সাহায্য দেওয়া এসময় স্থগিত করে।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

তহবিল সংগ্রহ (Fund Collection)

বিশাল সরকারি প্রশাসন, যুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির পরিচালনা এবং বিশ্বজনমত গঠনের জন্য মুজিবনগর সরকারের বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। এজন্য এ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তহবিল সংগ্রহ করা। এ লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ৮ মে যুক্তরাজ্যের বাঙালিদের বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে জরুরি সভার আয়োজন করে 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হন। বাংলাদেশ ফান্ডের মাধ্যমে ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারকে দেওয়া হয়। এছাড়া মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে নিম্নলিখিত অঙ্কের অর্থসাহায্য গ্রহণ করেছিল-

জাতিসংঘের মাধ্যমে

যুক্তরাষ্ট্র- ৮,৯১,৫৭,০০০ মার্কিন ডলার

যুক্তরাজ্য- ৩,৮১,১২,১৩২ মার্কিন ডলার

কানাডা-২,০২,৬০,৩০৭ মার্কিন ডলার

সোভিয়েত ইউনিয়ন- ২,০০,০০,০০০ মার্কিন ডলার

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

বিদেশ থেকে আরও কিছু সহযোগিতা:
বাহরাইনের বাংলাদেশ ক্লাব থেকে - ১৪৯৭.৫৭ পাউন্ড
কাতারের বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে - ৩১০০.২৯ পাউন্ড
লিবিয়ার বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে - ২৩৮২.৪২ পাউন্ড

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার ফলে বিশ্ববাসী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকবাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্ববাসীর যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতারই ফল। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়, তহবিল সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তুলেছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। মুজিবনগর সরকার পরের বছরের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফেরার আগেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। এটিও এ সরকারের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। সর্বোপরি বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৮ মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যার পর 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীল-নকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে এদেশের মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন চালাতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশের সকল অফিস-আদালত জনশূন্য হয়ে পড়ে। জীবন ও সম্ভ্রমের ভয়ে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যে যেখানে পারে পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সব কিছু স্বাভাবিক রয়েছে- বিশ্ববাসীর কাছে এটা প্রমাণ করার জন্য ২১ এপ্রিল সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার আদেশ জারি করে। বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার একজন বাঙালিকে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তার নেতৃত্বে এদেশে পাকিস্তানপন্থি কতিপয় পরিত্যক্ত বাংলাভাষী রাজনীতিকের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে। এ মন্ত্রিসভাটি ছিল নিম্নরূপ:

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

আবদুল মালিক-গভর্নর
আবুল কাশেম-অর্থ
আব্বাস আলী খান- শিক্ষা
আখতার উদ্দিন আহমেদ-বাণিজ্য, শিল্প, আইন ও সংসদ
এ এস এম সোলায়মান-শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা
মাওলানা এ কে এম ইউসুফ-রাজস্ব, পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ
মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক-মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
নওয়াজিশ আহমেদ-খাদ্য ও কৃষি
মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ মজুমদার-স্বাস্থ্য
অধ্যাপক শামসুল হক- সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তর

এই মন্ত্রিসভা ছিল টিক্কা খানের একান্ত আজ্ঞাবহ। এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের সমর্থক স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় বাঙালির সমন্বয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। এরা বিভিন্ন সময়ে মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর প্রদান করা থেকে শুরু করে পাকিস্তান বাহিনীর সব ধরনের অনৈতিক কাজের সঙ্গী হতো।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

রাজাকার (The Rajakar): 'রাজাকার' ফার্সি শব্দ। এর অর্থ স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় হায়দারাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে নিজাম নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 'রেজাকার' বাহিনী গঠন করেন। সেই থেকে রাজাকার শব্দটির উদ্ভব। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে যে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় তারা দেশের নয়, বরং হানাদার বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হয়। ১৯৭১ সালের জুন মাসে জেনারেল টিক্কা খান রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠন করা হয়। এরা ছিল সশস্ত্র মিলিশিয়া। শামসুল আরেফিন খানের একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়? গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন কর্মী নিয়ে খুলনায় এই বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ প্রভৃতি কাজে পাকিস্তান বাহিনীকে সহযোগিতা করত। এরা মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর রাখত এবং তাদের পাকিস্তান বাহিনীর হাতে তুলে দিত। এরা অনেক সময় পাকিস্তান আর্মির কাছে ধরিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে অসহায় জনগণের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য জিনিস আদায় করত। হিন্দু বাড়িতে হানা দিয়ে নারী ধর্ষণ করা ছিল এদের ভয়ঙ্কর কাজগুলোর অন্যতম। গ্রাম থেকে গরু-ছাগল ধরে নিয়ে পাক-আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বলে দেয়া, কার বাড়িতে সুন্দরী নারী রয়েছে তা পাক-আর্মিদের বলে দেয়া ছিল তাদের কাজ।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

আল বদর (The Al-Badr): মূলত ইসলামি ছাত্রসংঘের সদস্যদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করাই ছিল এ বাহিনীর মূল কাজ। এর প্রধান ছিলেন জামায়াত ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী। যুদ্ধাপরাধ মামলার বিচারে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।

আল শামস (The Al-Shams): আল শামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল অবাঙালি বিহারিদের নিয়ে। আলবদরের মতো এদের লক্ষ্য ছিল এদেশের স্বাধীনতার পক্ষের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

শান্তি কমিটি (Peace Committee): মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কতিপয় ডানপন্থি রাজনৈতিক দল পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতা করার ঘোষণা দেয়। ৪ এপ্রিল নূরুল আমিনের নেতৃত্বে গোলাম আযম এবং খাজা খয়েরউদ্দিনসহ ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে নাগরিক শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। এরই সূত্র ধরে ৯ এপ্রিল ঢাকার ডানপন্থি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করে। এটি পিস কমিটি নামেই অধিক পরিচিত। জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পিস কমিটি ছিল। এদের দালাল বলা হয়। এদের কাজ ছিল বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সহযোগিতা বা সমর্থন করা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা, পাকবাহিনীর অনুকূলে বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া, পাকবাহিনীর কোনো প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্য হওয়া ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় ১৪ ডিসেম্বর বেশকিছু সংখ্যক খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে শুরুতেই মেধাশূন্য করে ফেলা, যাতে করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। জাতির সূর্যসন্তানদের তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে।

যুদ্ধের পর বিভিন্ন বধ্যভূমিতে যেসব লাশ পাওয়া যায় তাদের কারও হাত-পা বাঁধা ছিল, কারও জিহ্বা কাটা ছিল, চক্ষু উপড়ানো ছিল কিংবা হাত-পা ভাঙা ছিল। কারও বা হৃৎপিণ্ড ছিল না। নারীদের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গে কাটাছেঁড়া করে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতার সাত দিনের মধ্যে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক অপহরণকৃত প্রায় তিনশত মেয়েকে ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে যেসব কুখ্যাত ব্যক্তি জড়িত ছিল তাদের যুদ্ধাপরাধ মামলায় বিচার হয়েছে এবং তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর) কার্যক্রম

টপিক – ০৯ পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

দীর্ঘ নয় মাস পর ঢাকার আকাশ-বাতাস আবার 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল চারটায় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খন্দকার এবং ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর অপরাপর প্রতিনিধিরা ঢাকা অবতরণ করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি শত্রুসৈন্যের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিছু পরেই ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে ভারতের পক্ষ থেকে এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান কেননা নিয়াজি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। নিয়াজী ১৬ তারিখে আত্মসমর্পণ করলেও সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্যের কাছে তখনও সে সংবাদ পৌছেনি। ফলে সকল পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণ করতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বেতারে আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হলে ঢাকা শহরের রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বেরিয়ে আসে এবং মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা' স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। রমনার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে এ এ কে নিয়াজি কোমরের বেল্ট থেকে তার রিভলবারটি খুলে লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দেন। সেই সাথে কাঁধের র‍্যাংক ব্যাজটিও খুলে অরোরার হাতে দেন। নিয়াজিকে অনুসরণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর সকল সৈনিক তাদের ব্যাজ খুলে ফেলে এবং একজন পরাজিত বন্দি হিসেবে আত্মসমর্পণ করে।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আত্মসমর্পণের দলিল (Instrument of Surrender)

আত্মসমর্পণ দলিলের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ-"পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণে সম্মতি প্রদান করছে। এই আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধাসামরিক এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিকেরা যে যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ লে. জেনারেল অরোরার অধীনস্থ সৈন্য বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। এই দলিল স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ড লে. জেনারেল অরোরার অধীন হয়ে যাবে। এই আদেশ যে অবজ্ঞা করবে তাকে আত্মসমর্পণ শর্তের পরিপন্থী বলে মনে করা হবে এবং যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আত্মসমর্পণ শর্তাবলি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে লে. জে. অরোরা সে বিষয়ে যে ব্যাখ্যা করবেন তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে। লে. জেনারেল অরোরা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জেনেভা চুক্তির

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

শর্তানুযায়ী সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। লে. জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।"

স্বাক্ষর/-
জগজিৎ সিং অরোরা
জি ও সি এবং
পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান
১৬.১২.১৯৭১

স্বাক্ষর/-
আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি
লে. জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি
এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের সর্বাধিনায়ক ১৬.১২.১৯৭১

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

উভয়পক্ষের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে। বিশ্ব মানচিত্রে ঠাঁই পায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

নিরাপত্তার যুক্তি তোলা হলে যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের ভারতে স্থানান্তর করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা আছে যার নাম জেনেভা কনভেনশন। এর আওতায় বন্দিকে নির্যাতন না করাসহ বিভিন্ন সুরক্ষা দিতে হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল না বলে মুক্তিবাহিনী সেই নীতিমালা মানতে বাধ্য ছিল না। এজন্য চতুর পাকিস্তানিরা ঝুঁকি নিতে চায়নি। বাঙালির প্রত্যাশা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের আওতায় আনবে। কিন্তু পরে সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকার যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করায় সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পাকিস্তানি বাহিনীর ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধ করার জন্য চিহ্নিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার অভিযুক্তদের বিচার করার অঙ্গীকার করেছিল। পরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর গঠিত বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনও এ বিষয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু এ সময়ের পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত সেনাদের বিচারের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিরিশ লাখ লোকের আত্মদান এবং দুই লাখের বেশি মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে বাংলার মানুষ লাভ করে নিজেদের স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড বাংলাদেশ। ভেঙে যায় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হাজার মাইলের বেশি দূরত্বের দুই ভূখণ্ডকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সব দিক থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশ ছিল ভিন্ন। তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ সবক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ওপর পশ্চিমাদের সীমাহীন বৈষম্য এবং নিপীড়ন এ ভাঙনকে অনিবার্য করে তোলে।

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা ঢাকায় এসে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরেন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১১ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা।

THANK YOU